স্বাস্থ্য সংলাপ

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ

ম্যালেরিয়া

রোগতত্ত্ব, চিকিৎসা ও নিয়ন্ত্রণ

মিল্‌কা প্যাট্রেশিয়া পোদ্দার, রুবায়েত এলাহী, এইচ এম আল-আমীন, মোহাম্মদ শফিউল আলম
আইসিডিডিআর,বি

ম্যালেরিয়া মশাবাহিত রোগগুলোর মধ্যে অন্যতম। অ্যানোফিলিস-এর বিভিন্ন প্রজাতির স্ত্রী মশা দ্বারা এই রোগটি একজন আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ থেকে সুস্থ ব্যক্তির দেহে ছড়িয়ে পড়ে। প্রোটোজোয়া পর্বভুক্ত প্লাজমোডিয়াম-নামক কিছু পরজীবী মানবদেহে ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে থাকে। আফ্রিকা, এশিয়া এবং আমেরিকা মহাদেশের নাতিশীতোষ্ণ এলাকায় এর প্রাদুর্ভাব সবচেয়ে বেশি। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-র হিসাব অনুযায়ী প্রতিবছর ৩০০-৫০০ মিলিয়ন মানুষ এই রোগে আক্রান্ত হয় এবং পৃথিবীর ৪০% মানুষ আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে আছে। আমাদের দেশে এটি একটি অন্যতম প্রধান জনস্বাস্থ্য সমস্যা। বাংলাদেশের পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব ১৩টি জেলার, বিশেষত সীমান্তবর্তী ৭০টি উপজেলায়, এই রোগের প্রাদুর্ভাব খুব বেশি। তবে, পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলায় (বান্দরবন, রাঙ্গামাটি ও খাগড়াছড়ি) পাঁচ কোটি লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে এবং প্রতিবছর কমপক্ষে ৫০ হাজার লোক ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয় (বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা প্রতিবেদন ২০০৯)। মানবদেহে ম্যালেরিয়া রোগসৃষ্টিকারী প্রধান পরজীবী প্রজাতিসমূহ হচ্ছে *প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম* (*Plasmodium falciparum*), *প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স* (*Plasmodium vivax*), *প্লাজমোডিয়াম ওভালি* (*Plasmodium ovale*) এবং *প্লাজমোডিয়াম ম্যালেরি* (*Plasmodium malariae*)। বাংলাদেশে *প্লাজমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম* এবং *প্লাজমোডিয়াম ভাইভ্যাক্স*-এর প্রাদুর্ভাব বেশি।

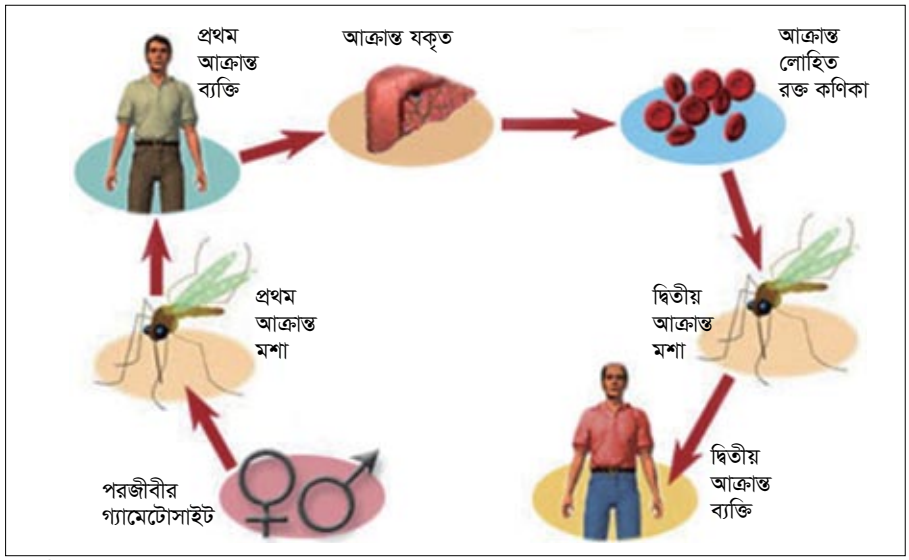

ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ চক্র

ম্যালেরিয়া জীবাণুর জীবনচক্র সম্পন্ন করতে দু'টি পোষকের প্রয়োজন হয়: মানুষ এবং স্ত্রী মশা। মানবদেহে ম্যালেরিয়া জীবাণু প্রবেশ করে রক্তের মাধ্যমে যকৃতে এসে পৌঁছায় এবং যকৃত কোষকে আক্রমণ করে এর ক্ষতিসাধন করে। পরে লোহিত কণিকায় প্রবেশ করে সংখ্যা বৃদ্ধি করতে থাকে। ফলে, লোহিত রক্তকণিকা বিদীর্ণ হয়ে যায় এবং মানবদেহে রক্তস্বল্পতা দেখা দেয়। স্ত্রী মশা যখন ম্যালেরিয়া জ্বরে আক্রান্ত ব্যক্তির দেহ থেকে রক্ত শোষণ করে তখন বিভিন্ন স্তরের পরজীবী তার মধ্যে প্রবেশ করে এবং সেখানে অব্যাহতভাবে বংশবৃদ্ধি করতে থাকে। পরে জীবাণুগুলো স্ত্রী মশার লালাগ্রন্থিতে প্রবেশ করে। মানুষকে কামড়ানোর ফলে এগুলো মানবদেহে প্রবেশ করে নতুন করে ম্যালেরিয়া রোগ সৃষ্টি করে।

বিগত দশ বছরে বাংলাদেশে মোট ম্যালেরিয়া রোগীর সংখ্যা

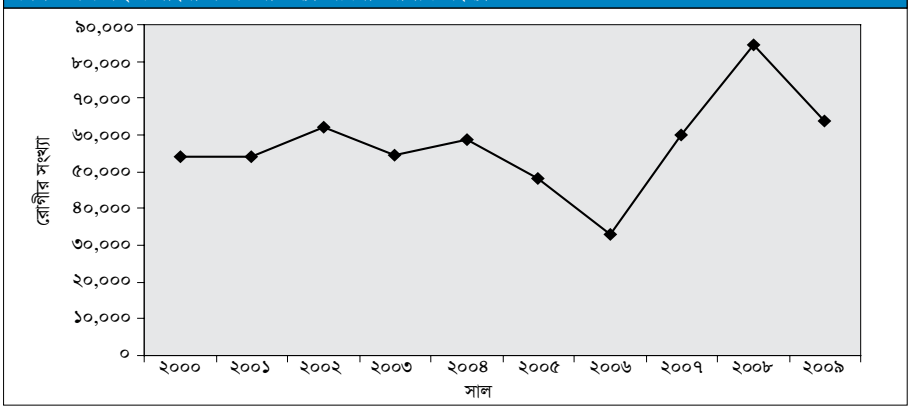

রোগের লক্ষণসমূহ

ম্যালেরিয়া পরজীবী দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার ২-৩ সপ্তাহ পর রোগীর মধ্যে নিম্নোক্ত লক্ষণসমূহ দেখা যায়:

- নির্দিষ্ট সময় পরপর কাঁপুনিসহ জ্বর আসা ও ঘাম দিয়ে ছেড়ে যাওয়া
- ক্ষুধামন্দা ও বমি বমি ভাব
- মাথা ব্যথা
- রক্তস্বল্পতা
- প্লীহা ও যকৃত বড় হওয়া
- জ্বর ১০৪°-১০৬° ফারেনহাইট পর্যন্ত হতে পারে
- জ্বর কমলে শরীরের তাপমাত্রা স্বাভাবিকের চেয়েও নিচে নেমে যাওয়া

ভেতরের পাতায়

- থ্যালাসেমিয়া এবং হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার
- মাসিক নিয়মিতকরণ: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ
- জলবায়ু পরিবর্তন এবং বাংলাদেশ
- বন্ধু জীবাণু প্রোবায়োটিক্স

বর্ষ ২০ | সংখ্যা ১
শ্রাবণ ১৪১৮ | আগস্ট ২০১১
ISSN 1021-2078

icddr,b
KNOWLEDGE FOR
GLOBAL LIFESAVING SOLUTIONS

আন্তর্জাতিক উদরাময় গবেষণা কেন্দ্র, বাংলাদেশ (আইসিডিডিআর,বি) উন্নয়নশীল বিশ্বের সর্ববৃহৎ স্বাস্থ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠান। কলেরাসহ ডায়রিয়াজাতীয় রোগের ওপর গবেষণা, এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের লক্ষ্যে ১৯৬০ সালে পাক-সিয়াটো কলেরা রিসার্চ ল্যাবরেটরি নামে ঢাকার মহাখালিতে যে-প্রতিষ্ঠান জন্মলাভ করে, মূলত সে-প্রতিষ্ঠানই ১৯৭৮ সালে আন্তর্জাতিকীকরণের মাধ্যমে তার বর্তমান নাম ধারণ করে। এ-প্রতিষ্ঠানের গবেষণা ও সেবাদান-সংক্রান্ত কর্মপরিধি এখন আর কেবল ডায়রিয়াজাতীয় রোগের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। শিশু-স্বাস্থ্য, প্রজনন-স্বাস্থ্য, পুষ্টি বিজ্ঞান, সংক্রামক ব্যাধি ও টিকাবিষয়ক বিজ্ঞান, ক্রনিক ও অসংক্রামক রোগ, এইচআইভি/এইডস্, স্বাস্থ্যের ওপর দারিদ্র্যের প্রভাব, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা-বিষয়ক কর্মকাঠামো, জেন্ডার, স্বাস্থ্য ও মানবাধিকার আইসিডিডিআর,বি-র গবেষণা কর্মসূচিতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। ডায়রিয়া রোগীর জীবন রক্ষাকারী খাবার স্যালাইনের আবিষ্কার ও উন্নতমানের স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত গবেষণার জন্য আইসিডিডিআর,বি পৃথিবী বিখ্যাত।

স্বাস্থ্য সংলাপ

সম্পাদনা পরিষদ

প্রধান সম্পাদক	আলেহান্দ্রো ক্র্যাভিওটো
উপ-প্রধান সম্পাদক	প্রদীপ কুমার বর্ধন
ব্যবস্থাপনা সম্পাদক	এম শামসুল ইসলাম খান
সম্পাদক	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

সদস্য

আসেম আনসারী, রুখসানা গাজী, মোঃ জাহাঙ্গীর হোসেন, মোঃ ইকবাল, মাসুমা আক্তার খানম, মোঃ আনিসুর রহমান ও রুবহানা রকিব

সহযোগিতায়	হামিদা আক্তার
পৃষ্ঠাবিন্যাস	সৈয়দ হাসিবুল হাসান

কারা স্বাস্থ্য সংলাপ পেতে পারেন

যেকোনো পর্যায়ের স্বাস্থ্যকর্মী, পল্লী-চিকিৎসক, সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গ্রন্থাগারসমূহে বিনামূল্যে স্বাস্থ্য সংলাপ পাঠানো হয়। স্বাস্থ্যকর্মী হলে আপনার নাম, পদবী ও প্রতিষ্ঠান এবং পূর্ণ ঠিকানা ব্যবস্থাপনা সম্পাদক বরাবর ইংরেজিতে লিখে পাঠান। সমাজ উন্নয়নে নিয়োজিত সমিতি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে অবশ্যই সীলমোহরযুক্ত দাপ্তরিক প্যাডে আবেদন করতে হবে।

প্রকাশক

আইসিডিডিআর,বি
মহাখালি, ঢাকা ১২১২
(জিপিও বক্স ১২৮, ঢাকা ১০০০), বাংলাদেশ
ফোন: (৮৮০২) ৮৮২২৪৬৭, ৮৮৬০৫২৩-৩২
ফ্যাক্স: (৮৮০২) ৮৮১৯১৩৩, ৮৮২৩১১৬
ইমেইল: hasib@icddrb.org

কোনো লেখায় ব্যক্ত মতামতের জন্য প্রকাশক বা সম্পাদকমণ্ডলী দায়ী নন

মুদ্রণ: দিনা অফসেট প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা

রোগনির্ণয় পদ্ধতি

দ্রুত এবং সঠিক রোগ নিরূপণ যেকোনো রোগের চিকিৎসার পূর্বশর্ত। ম্যালেরিয়াও এর ব্যতিক্রম নয়। ম্যালেরিয়ার রোগ নির্ণয় পদ্ধতিগুলো নিচে উল্লেখ করা হলো:

- এমপি টেস্ট: এটি অনুবীক্ষণযন্ত্রের নিচে রক্তে ম্যালেরিয়া জীবাণুর উপস্থিতি নির্ণয়ের পরীক্ষা। এটি সবচেয়ে সহজলভ্য পরীক্ষা।
- স্ট্রিপ পদ্ধতি: বর্তমানে ম্যালেরিয়া রোগ নিরূপণের জন্য বাজারে বিভিন্ন ধরনের স্ট্রিপ পাওয়া যায়। সেগুলো আরডিটি (RDT) নামে পরিচিত। এসব স্ট্রিপ ফ্যালসিপেরাম ও ভাইভ্যাক্স ছাড়াও অন্যান্য ম্যালেরিয়া জীবাণুর উপস্থিতি নির্ণয় করতে পারে। এই পদ্ধতিতে ১০-১৫ মিনিটের মধ্যে ম্যালেরিয়া রোগ নিরূপণ করা সম্ভব।
- মলিকুলার পরীক্ষা: এই পদ্ধতির মাধ্যমে নির্ভুল রোগ নিরূপণ সম্ভব। এই পদ্ধতির মধ্যে পিসিআর উল্লেখযোগ্য। তবে এই পরীক্ষা ব্যয়বহুল, সময় সাপেক্ষ এবং এর জন্য দক্ষ ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত লোকের প্রয়োজন।
- ব্লাড কালচার: এই পরীক্ষার মাধ্যমেও নির্ভুলভাবে রোগ নিরূপণ সম্ভব।

এছাড়াও জটিল ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে, সেরাম ক্রিয়েটিনিন, সেরাম ইলেক্ট্রোলাইটস, ব্লাড কাউন্ট প্রভৃতি পরীক্ষা করানো প্রয়োজন।

চিকিৎসা

বাংলাদেশে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা-সংক্রান্ত নীতিমালা জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচী-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। জাতীয় ম্যালেরিয়া নিয়ন্ত্রণ কর্মসূচীর ওয়েব সাইটে (www.nmcp.info) গিয়ে যে কেউ এই নীতিমালাটি ডাউনলোড করতে পারেন। বর্তমানে ম্যালেরিয়া উপদ্রুত এলাকার সরকারী স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বিনামূল্যে ম্যালেরিয়ার চিকিৎসা প্রদান করা হয়।

১) ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়া

ক) সাধারণ ম্যালেরিয়া (uncomplicated malaria)

সাধারণ ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে যত দ্রুত সম্ভব চিকিৎসা প্রদান মারাত্মক ম্যালেরিয়ার ঝুঁকি কমায়।

নিচের সারণীতে আর্টিমিথার-লুমিফ্যানট্রিন সমন্বিত চিকিৎসা (ACT) পদ্ধতি দেখানো হলো:

রোগ নির্ণয়ের সাথে সাথেই উল্লেখিত চিকিৎসা শুরু করতে হবে। প্রথম ডোজ দেওয়ার ৮ ঘন্টা পর ২য় ডোজ, ২৪ ঘন্টা পর ৩য় ডোজ, এবং পরবর্তী তিনটি ডোজ ১২ ঘন্টা পর পর দিতে হবে। যদি কোনো ক্ষেত্রে ACT দেওয়া সম্ভব না হয় তাহলে নিম্নোক্ত চিকিৎসা দেওয়া যেতে পারে:

কুইনাইন (৭ দিন) + টেট্রাসাইক্লিন (৭ দিন)

অথবা কুইনাইন (৭ দিন) + ডক্সিসাইক্লিন (৭ দিন)

অথবা কুইনাইন (৭ দিন) + ক্লিনডামাইসিন (৭ দিন)

অথবা, সহজলভ্যতার ভিত্তিতে WHO-র সুপারিশকৃত যেকোনো ACT (যেমন: আর্টিসুনেট-মফ্লোকুইন, আর্টিসুনেট-অ্যামোডিনাকুইন)

সর্তকতা: আট বছরের কমবয়সী শিশু এবং দুগ্ধদানকারী ও গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে টেট্রাসাইক্লিন ও ডক্সিসাইক্লিন সেবনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে।

এছাড়াও উপরোক্ত চিকিৎসার ক্ষেত্রে ACT-র সাথে এক ডোজ ০.৭৫ মিগ্রা/কেজি শরীর-ওজন প্রিমাকুইন দিতে হবে। গর্ভাবস্থায় এবং চার বছরের কমবয়সী শিশুদের প্রিমাকুইন দেওয়া যাবে না।

খ) তীব্র ম্যালেরিয়া (severe malaria)

তীব্র ম্যালেরিয়া নিরূপিত হওয়ার সাথে সাথেই রোগীকে নিকটবর্তী হাসপাতালে ভর্তির ব্যবস্থা করতে হবে। রোগীকে হাসপাতালে পাঠানোর আগেই (যদি সহজলভ্য হয়) কুইনিন আইএম/রেক্টাল আর্টিসুনেট দিতে হবে। আইভি আর্টিসুনেট হাসপাতালে একজন জটিল ম্যালেরিয়া রোগীর জন্য সর্বোত্তম চিকিৎসা। আইভি আর্টিসুনেট দেওয়ার পর যখন রোগী মুখে ওষুধ খেতে পারবে তখন থেকে সম্পূর্ণ এক কোর্স ACT দেওয়া উচিত।

২) ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়া

ভাইভ্যাক্স ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে ক্লোরোকুইন (৩ দিন)-এর সাথে প্রিমাকুইন (১৪ দিন) দেওয়া প্রয়োজন।

ক্লোরোকুইন

১ম দিন–১০ মিগ্রা/কেজি (প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ৪টি ট্যাবলেট)

দিন	ডোজ	সময় (ঘণ্টা)	শরীরের ওজন (কেজি)			
			৫-১৫	১৫-২৫	২৫-৩৫	>৩৫
১ম	১ম	০	১	২	৩	৪
	২য়	৮	১	২	৩	৪
২য়	৩য়	২৪	১	২	৩	৪
	৪র্থ	৩৬	১	২	৩	৪
৩য়	৫ম	৪৮	১	২	৩	৪
	৬ষ্ঠ	৬০	১	২	৩	৪

২য় দিন–১০ মিগ্রা/কেজি (প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ৪টি ট্যাবলেট)

৩য় দিন–৫ মিগ্রা/কেজি (প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য ২টি ট্যাবলেট)

প্রিমাকুইন

প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য প্রতিদিন ১টি ট্যাবলেট ১৪ দিন ধরে (১টি ট্যাবলেট=১৫ মিগ্রা)

শিশুদের জন্য ০.৩ মিগ্রা/কেজি ১৪ দিন ধরে প্রতিদিন

তবে গর্ভবতী মহিলাদের ক্ষেত্রে প্রিমাকুইন বর্জন করতে হবে।

নিয়ন্ত্রণ

মশার মাধ্যমে ম্যালেরিয়া রোগের বিস্তার ঘটে বলে মশা নিবারণই এ-রোগ নিয়ন্ত্রণের প্রধান উপায়। মশা নিয়ন্ত্রণের জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থাগুলো গ্রহণ করা যায়:

- বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার করে পূর্ণবয়স্ক মশা অথবা এর শূককীট ধ্বংস করা।
- যেসব জলাশয়ে মশার শূককীট রয়েছে সেখানে গাপ্পি, কই, খলসে বা ভেদা মাছ ছেড়ে দেওয়া, কারণ এসব মাছ শূককীট খেয়ে মশা ধ্বংস করে।
- সন্ধ্যাবেলায় মশার কয়েল কিংবা ধূপ জ্বালিয়ে মশা তাড়ানো।

- রাতে ঘুমানোর সময় মশারি বা কীটনাশক মিশ্রিত মশারি ব্যবহার করা।
- পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখা এবং আশপাশের নর্দমায় জলবদ্ধতা সৃষ্টি হতে না-দেওয়া।

থ্যালাসেমিয়া এবং হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার

হাফিজুর রহমান
আইসিডিডিআর,বি

হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার (haemoglobin disorder) সম্পর্কে কোনো কিছু বলতে গেলে প্রথমেই যেসব প্রশ্ন মনে আসে তা হলো: হিমোগ্লোবিন কী, কোথায় থাকে এবং এর প্রয়োজনীয়তা কী? সংক্ষেপে বলতে গেলে, হিমোগ্লোবিন হচ্ছে এক প্রকার লৌহমিশ্রিত লাল পদার্থ যা আমাদের রক্তের লোহিত কণিকার (RBC) মধ্যে থাকে এবং শরীরের বিভিন্ন কোষে অক্সিজেন (O_2) সরবরাহ করে কোষগুলোকে সক্রিয় রাখে। পক্ষান্তরে, কার্বন-ডাই-অক্সাইড (CO_2)-এর মাধ্যমে বর্জ্য পদার্থ শরীর থেকে বের করে দেয়। শরীরে কোষগুলো সক্রিয় থাকে বলেই আমরা সুস্থ থাকি। সুতরাং হিমোগ্লোবিনের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুমেয়।

যদি কোনো কারণে এই হিমোগ্লোবিনের গঠনপ্রণালীতে কোনো গোলযোগের সৃষ্টি হয় এবং তার ফলে যে রোগের সৃষ্টি হয়, চিকিৎসাশাস্ত্রে তাকে 'হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার' বলে। এটি একটি বংশগত রোগ (hereditary disease)। যে বংশে এই রোগ আছে সেই বংশের লোকজনই বংশানুক্রমে এটা বহন করে অথবা এ-রোগে আক্রান্ত হয়। বাবা-মা থেকে সন্তানদের মধ্যে জিন (gene) এর মাধ্যমে এটি প্রবেশ করে। এটি কোনো ছোঁয়াচে বা সংক্রামক রোগ নয়। একজনের শরীর থেকে অন্যজনের শরীরে বাতাস, খাবার, পানীয়, কাপড় বা সংস্পর্শের মাধ্যমে এ-রোগ ছড়ায় না।

হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার অনেক ধরনের হয়ে থাকে, যেমন: বিটা থ্যালাসেমিয়া (β thalassaemia), আলফা থ্যালাসেমিয়া (α thalassaemia), হিমোগ্লোবিন-ই (Hb-E), হিমোগ্লোবিন-এস (Hb-S), হিমোগ্লোবিন-সি (Hb-C), হিমোগ্লোবিন-ডি পাঞ্জাব (Hb-D Panjab), ইত্যাদি। পৃথিবীর সব দেশে এই রোগ ছড়িয়ে আছে। তবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় এবং ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে থ্যালাসেমিয়া বেশি দেখা যায়। হিমোগ্লোবিন-ই (Hb-E) দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বেশি দেখা যায় এবং হিমোগ্লোবিন-এস (Hb-S) ও হিমোগ্লোবিন-সি (Hb-C) আফ্রিকা মহাদেশের গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে এবং আমেরিকার নিগ্রোদের মধ্যে বেশি দেখা যায়। হিমোগ্লোবিন-ডি পাঞ্জাব (Hb-D Panjab) সাধারণত পাকিস্তান, ইরান ও ভারতের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বেশি দেখা যায়। হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার-এর মধ্যে বিটা থ্যালাসেমিয়া এবং হিমোগ্লোবিন-ই ডিসঅর্ডার আমাদের দেশে বেশি দেখা যায় বলে এই লেখায় সংক্ষেপে এই দুটো রোগ সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো।

বিটা থ্যালাসেমিয়া (beta thalassaemia)

আগেই বলা হয়েছে এটি এক ধরনের হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার এবং বংশগত রোগ। প্রাচীনকালে এই রোগ Mediterranean anaemia নামে প্রচলিত ছিলো। এ-রোগকে আবার Cooley's anaemia-ও বলা হয়। থ্যালাসেমিয়া রোগীর বাবা-মা, ভাই-বোন এবং নিকট আত্মীয়স্বজনেরা জন্মগতভাবে এ-রোগের বাহক হতে পারে। বাবা-মা থেকে সন্তানের মধ্যে যে জিনের মাধ্যমে এটা প্রবেশ করে তাকে বিটা থ্যালাসেমিয়া জিন (beta thalassaemia gene) বলা হয়ে থাকে। জিনের গঠনতন্ত্রের ত্রুটি এবং এর প্রকৃতি ও পরিমাণের ওপর ভিত্তি করে বিটা থ্যালাসেমিয়াকে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা হয়, যথা:

১) বিটা থ্যালাসেমিয়া মেজর (beta thalassaemia major)

২) বিটা থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া (beta thalassaemia intermedia)

৩) বিটা থ্যালাসেমিয়া মাইনর (beta thalassaemia minor) বা বিটা থ্যালাসেমিয়া ট্রেইট (beta thalassaemia trait)

বিটা থ্যালাসেমিয়া মেজর (beta thalassaemia major)

এ-রোগে আক্রান্তদের বাবা-মা দু'জনই বিটা থ্যালাসেমিয়ার বাহক (beta thalassaemia trait) এবং উভয়ের কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে বিটা থ্যালাসেমিয়া জিন পায় বলে এদেরকে বিটা থ্যালাসেমিয়া মেজর বলা হয়। ছোটবেলা থেকেই এরা অতিমাত্রায় রক্তশূন্যতায় (severe anaemia) ভোগে। শিশুর জন্মের সময় রক্তশূন্যতা দেখা যায় না; সাধারণত তিন মাস থেকে আঠারো মাসের মধ্যে এ-রোগের লক্ষণ দেখা দেয়। শিশু ধীরে ধীরে ফ্যাকাশে ও দুর্বল হয়ে পড়ে, ঘুমাতে পারে না, খেতে পারে না এবং খাওয়ার পর বমি করে। রক্তের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ৩.০-৫.০ গ্রাম/ডেসিলিটার-এ নেমে আসে। অনেকসময় জন্ডিস দেখা দেয়। যকৃত (liver) এবং প্লীহা (spleen) আস্তে আস্তে বড় হতে থাকে, ফলে এদের পেটও বড় হতে থাকে। এসময় মুখমণ্ডলের পরিবর্তনও (thalassaemic facies) দেখা দেয়। চিকিৎসা করা না হলে ৫ থেকে ৬ বছরের মধ্যে শিশুর মৃত্যু হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। মৃত্যুর প্রধান কারণ সাধারণত হৃদরোগ এবং বিভিন্ন ধরনের সংক্রামক রোগ। যদি শুধু রক্ত সঞ্চালন (blood transfusion) দ্বারা চিকিৎসা করা হয় তবে আক্রান্ত শিশু ১৮-২০ বছর পর্যন্ত বেঁচে থাকে। আর যদি নিয়মিত রক্ত সঞ্চালনের পাশাপাশি লৌহ অপসারণকারী ওষুধ (iron-chelating agent) দিয়ে চিকিৎসা করা হয় তবে আক্রান্ত শিশু প্রায় সুস্থভাবে বেড়ে উঠে এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করে।

বিটা থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া (beta thalassaemia intermedia)

এদেরও বাবা-মা দু'জনই বিটা থ্যালাসেমিয়ার বাহক

এবং উভয়ের কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে বিটা থ্যালাসেমিয়া জিন পায়, তবে এদের অবস্থান বিটা থ্যালাসেমিয়া মেজর এবং থ্যালাসেমিয়া মাইনর-এর মাঝামাঝি। অর্থাৎ, এদের মধ্যে যে উপসর্গ দেখা যায় তা থ্যালাসেমিয়া মেজর-এর মতো ভয়াবহ আকার ধারণ করে না আবার থ্যালাসেমিয়া মাইনর-এর চেয়ে বেশি হয়। এদের রোগের লক্ষণ সাধারণত ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে প্রকাশ পায় এবং কখনও কখনও থ্যালাসেমিয়া মেজর-এর মতো সব উপসর্গ দেখা দিলেও এ-রোগের প্রকটতা ততটা মারাত্মক আকার ধারণ করে না। এসব রোগীর যে ধরনের রক্তশূন্যতা হয় তার জন্য ঘন ঘন বা নিয়মিত রক্ত পরিসঞ্চালনের দরকার পড়ে না, মাঝে মাঝে রক্ত নেওয়ার প্রয়োজন হয়। এজন্য এদেরকে বিটা থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া বলে।

বিটা থ্যালাসেমিয়া মাইনর (beta thalassaemia minor)

এরা বাবা কিংবা মা, যেকোনো একজনের কাছ থেকে বিটা থ্যালাসেমিয়ার জিন পায় বলে এদেরকে বিটা থ্যালাসেমিয়া মাইনর বা বিটা থ্যালাসেমিয়া ট্রেইট (beta thalassaemia minor or trait) বলা হয়। এরা সুস্থ বাহক (healthy carrier) এবং এদের কোনো উপসর্গ দেখা যায় না, তবে এরা সামান্য রক্তশূন্যতায় ভুগতে পারে। এজন্য এদের কাজকর্ম করতে কোনো অসুবিধা হয় না এবং এরা স্বাভাবিক জীবনযাপন করে। উল্লেখ্য, যেহেতু রোগী বিটা থ্যালাসেমিয়া জিন সারাজীবন বহন করে, পরবর্তী সময়ে সন্তানদের মধ্যে এটা প্রবেশ করার সম্ভাবনা থাকে এবং এভাবেই বংশ পরম্পরায় বিটা থ্যালাসেমিয়া বিস্তার লাভ করে। একারণেই এটা গুরুতর। এরা সামান্য রক্তশূন্যতায় ভুগতে পারে এবং তাই এটিকে অনেক সময় লৌহ-এর অভাবজনিত রক্তশূন্যতা (iron-deficiency anaemia) মনে করে বিভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। এক্ষেত্রে অবশ্যই হিমোগ্লোবিন/ক্যাপিলারি ইলেকট্রোফোরেসিস (Hb/capillary electrophoresis) করে বাহককে চিহ্নিত করা দরকার, কারণ বাহককে দীর্ঘমেয়াদী লৌহ (iron) দিয়ে চিকিৎসা করা হলে ভবিষ্যতে তার ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

হিমোগ্লোবিন-ই ডিসঅর্ডার (Hb-E disorder)

বিটা থ্যালাসেমিয়ার মতো হিমোগ্লোবিন-ই-ও আমাদের দেশে খুব বেশি দেখা যায়। এটিও একধরনের হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার এবং বংশগত রোগ। এ-রোগ দু'ধরনের হয়ে থাকে:

১) হিমোগ্লোবিন-ই ট্রেইট (Hb-E trait)

২) হিমোগ্লোবিন-ই ডিজিজ (Hb-E disease)

যারা বাবা কিংবা মা, যেকোনো একজনের কাছ থেকে হিমোগ্লোবিন-ই-এর জিন পায় তাদেরকে হিমোগ্লোবিন-ই-এর বাহক (Hb-E trait or carrier) বলা হয় আর যারা উভয়ের কাছ থেকেই উত্তরাধিকারসূত্রে এই জিন পায় তাদের রোগকে হিমোগ্লোবিন-ই ডিজিজ (Hb-E disease) বলা হয়। যারা হিমোগ্লোবিন-ই-এর বাহক কিংবা হিমোগ্লোবিন-ই ডিজিজ-এ আক্রান্ত তাদের কারোরই কোনো উপসর্গ দেখা দেয় না। তবে তারা সামান্য রক্তশূন্যতায় ভুগতে পারে। তাই তারাও বিটা থ্যালাসেমিয়া বাহক (beta thalassaemia trait)-এর মতো স্বাভাবিক জীবনযাপন করে। যেহেতু এরাও সারা জীবন হিমোগ্লোবিন-ই-এর জিন বহন করে, পরবর্তীতে সন্তানদের মধ্যে এটা প্রবেশের সম্ভাবনা থাকে এবং এভাবে বংশ পরম্পরায় এ-রোগ বিস্তার লাভ করে। দুর্ভাগ্যক্রমে যদি এদের সাথে বিটা থ্যালাসেমিয়া বাহকের বিয়ে হয়, তবে ২৫% ক্ষেত্রে হিমোগ্লোবিন-ই/বিটা থ্যালাসেমিয়া (Hb-E/beta thalassaemia) শিশুর জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।

থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত একটি শিশুকে রক্ত দেওয়া হচ্ছে

ছবি: আব্দুর রহিম

হিমোগ্লোবিন-ই/বিটা থ্যালাসেমিয়া (Hb-E beta thalassaemia)

আগেই বলা হয়েছে, আমাদের দেশে বিটা থ্যালাসেমিয়া থেকে হিমোগ্লোবিন-ই/বিটা থ্যালাসেমিয়ার সংখ্যা অনেক বেশি (১:৭)। রোগের লক্ষণ এবং প্রকটতার ওপর ভিত্তি করে হিমোগ্লোবিন-ই/বিটা থ্যালাসেমিয়াকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা:

ক) Mild Hb-E/beta thalassaemia (স্বল্প রক্তশূন্যতা)

প্রায় ১৫% রোগী এই গ্রুপের মধ্যে পড়ে। এদের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ৯.০-১২.০ গ্রাম/ডেসিলিটার-এর মধ্যে থাকে। এরা সুস্থ শিশুর মতো ধীরে ধীরে বেড়ে ওঠে এবং প্রায় স্বাভাবিক জীবনযাপন করে। এদের রক্ত গ্রহণেরও প্রয়োজন হয় না। তবে কখনও কখনও সংক্রামক ব্যাধি, গর্ভধারণ, রক্তক্ষরণ অথবা অন্য কোনো কারণে হিমোগ্লোবিন খুব বেশি কমে যেতে পারে এবং সেক্ষেত্রে রক্ত পরিসঞ্চালনের প্রয়োজন হতে পারে। তবে এরা সামান্য রক্তশূন্যতায় ভুগতে পারে এবং সে-কারণে অনেক সময় লৌহ-এর অভাবজনিত রক্তশূন্যতা (iron-deficiency anaemia) মনে করে বিভ্রান্তি ঘটার সম্ভাবনা থাকে। তাই এক্ষেত্রে অবশ্যই হিমোগ্লোবিন/ক্যাপিলারি ইলেকট্রোফোরেসিস (Hb/capillary electrophoresis) না-করে রোগীকে লৌহ (iron) দিয়ে চিকিৎসা করা ঠিক হবে না। তারা লৌহের অভাবে রক্তশূন্যতায় ভোগে না। তাই লৌহ দিয়ে চিকিৎসা করালে রোগীর লাভ তো হবেই না বরং ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি থাকে।

খ) Moderate Hb-E/beta thalassaemia (মাঝারী রক্তশূন্যতা)

অধিকাংশ রোগীই এই গ্রুপের মধ্যে পড়ে। এদের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ৬.০-৭.০গ্রাম/ডেসিলিটার-এর মধ্যে থাকে। এদের রোগের লক্ষণ বিটা থ্যালাসেমিয়া ইন্টারমিডিয়া (beta thalassaemia intermedia)-এর মতো। এদের সবসময় রক্ত গ্রহণের প্রয়োজন হয় না। যদি কোনো কারণে এদের হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ আরো কমে যায় (যেমন ইনফেকশন কিংবা অন্য কোনো অসুখের দ্বারা) তাহলে অবশ্যই রক্ত দিতে হবে। এদের ক্ষেত্রেও রক্তে লৌহের পরিমাণ বেড়ে যায় এবং সেক্ষেত্রে রক্তে লৌহের পরিমাণ যদি নির্দিষ্ট মাত্রার (>১০০০ ন্যানোগ্রাম/মিলিলিটার) বেশি থাকে তাহলে অবশ্যই অতিরিক্ত লৌহ অপসারণ করার জন্য ওষুধ (iron-chelating agents) ব্যবহার করতে হবে।

গ) Severe Hb-E/beta thalassaemia (তীব্র রক্তশূন্যতা)

এই রোগের লক্ষণগুলো সাধারণত থ্যালাসেমিয়া মেজর (thalassaemia major)-এর মতোই হয়ে থাকে। এসব রোগীরা ছোটবেলা থেকেই তীব্র রক্তশূন্যতায় ভুগতে থাকে। এদের রক্তে হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ ৪.০-৫.০ গ্রাম/ডেসিলিটার-এ নেমে আসে এবং এর ফলে এদের স্বাভাবিক শারীরিক বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এরাও সাধারণত জন্ডিস (jaundice)-এ আক্রান্ত হয়, যকৃত এবং প্লীহা আস্তে আস্তে বাড়তে

থাকে এবং ধীরে ধীরে মুখমণ্ডলের পরিবর্তনও দেখা দেয়। এদেরকে সবসময়ই নিয়মিতভাবে রক্তগ্রহণ করতে হয় এবং এদের অন্যান্য চিকিৎসা পদ্ধতিও থ্যালাসেমিয়া মেজরের মতোই।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO)-প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, পৃথিবীর প্রায় ৬.৫% লোক জন্মগতভাবে থ্যালাসেমিয়া বা ত্রুটিপূর্ণ হিমোগ্লোবিনের বাহক। পৃথিবীর প্রায় ১০০ মিলিয়ন লোক বিটা-থ্যালাসেমিয়ার বাহক এবং প্রায় ৩ থেকে ৫ লক্ষ শিশু প্রতিবছর থ্যালাসেমিয়া মেজর রোগ নিয়ে জন্মায়। বিশ্বব্যাপী প্রায় ৫.৩ মিলিয়ন লোক হিমোগ্লোবিন-ই নামে পরিচিত ত্রুটিপূর্ণ হিমোগ্লোবিন-এর বাহক। সত্যিকার অর্থে, আমাদের দেশে থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে কোনো সঠিক তথ্য নেই এবং এখন পর্যন্ত কোনো জনগোষ্ঠীর ওপর এ-সংক্রান্ত কোনো জরিপও চালানো হয় নি। ধারণা করা হয় যে, আমাদের দেশে ৪.১% লোক বিটা থ্যালাসেমিয়া এবং ৬.১% লোক হিমোগ্লোবিন-ই-এর বাহক, হিমোগ্লোবিন-ই/বিটা থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ২০০,০০০ এবং বিটা-থ্যালাসেমিয়া মেজরে আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা ৫০,০০০। প্রতি বছর প্রায় ৬-৭ হাজার শিশু থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত অবস্থায় জন্মগ্রহণ করে। ভৌগোলিক বণ্টন অনুযায়ী দেখা গেছে, বাংলাদেশে বিটা-থ্যালাসেমিয়া এবং হিমোগ্লোবিন-ই ডিসঅর্ডার বেশি। তাই বলা যায়, এটি একটি বড় ধরনের সমস্যা এবং এ-রোগ থেকে মুক্তি পেতে হলে দেশের প্রতিটি নাগরিককে এই জটিল রোগ সম্পর্কে সচেতন হতে হবে এবং সেই অনুযায়ী প্রয়োজনীয়, সময়োপযোগী এবং দীর্ঘমেয়াদী পদক্ষেপ নিতে হবে। কয়েকটি পদক্ষেপ গ্রহণ করে আমাদের দেশেও জটিল এ-রোগ প্রতিরোধ ও নির্মূল করা সম্ভব।

স্বাস্থ্য ও থ্যালাসেমিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান

থ্যালাসেমিয়া সম্পর্কে সাধারণ জনগণকে সতর্ক করতে হবে। সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে এবং বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংস্থা কর্তৃক সেমিনার, ওয়ার্কশপ, ইত্যাদি আয়োজনের ব্যবস্থা করতে হবে এবং দৈনিক পত্রিকাগুলোতে এসব বিষয়ে লেখালেখি করতে হবে। টেলিভিশন ও রেডিওতে প্রচার চালাতে হবে। ৮ই মে 'বিশ্ব থ্যালাসেমিয়া দিবস'-এ বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে এই দিনটির তাৎপর্য এবং থ্যালাসেমিয়ার সাম্প্রতিক চিত্র তুলে ধরতে হবে। এটি অত্যন্ত দুঃখজনক হলেও সত্যি যে, ঢাকা ছাড়া দেশের অন্য কোথাও থ্যালাসেমিয়ার সুচিকিৎসার কোনো ব্যবস্থা নেই।

বংশ-সংশ্লিষ্ট লক্ষণীয় বিষয়সমূহ

যে পরিবার হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার-এর বাহক কিংবা এ-রোগে আক্রান্ত, তাদের নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং সম্ভব হলে নিম্নোক্ত কিছু পরামর্শ মেনে চলতে হবে:

- থ্যালাসেমিয়া আসলে হিমোগ্লোবিন ডিসঅর্ডার-জনিত একটি বংশগত রোগ, যা বাবা-মা থেকে সন্তানদের মধ্যে জিন-এর মাধ্যমে প্রবেশ করে।
- বাবা-মা উভয়েই বাহক হলে থ্যালাসেমিয়া রোগযুক্ত শিশুর জন্ম হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, নতুবা নয়।
- বাবা-মার যেকোনো একজন বাহক হলে এবং অন্যজন সুস্থ হলে থ্যালাসেমিয়া রোগযুক্ত শিশুর জন্ম হবে না।

বংশানুক্রমিকভাবে থ্যালাসেমিয়ার ধারা

- বিয়ের আগে সবার রক্ত পরীক্ষা করে জেনে নেওয়া দরকার তারা থ্যালাসেমিয়ার বাহক কী না।
- যে বাহক তার অপর একজন বাহককে বিয়ে না করাই ভালো। তাহলেই থ্যালাসেমিয়া শিশুর জন্ম প্রতিরোধ করা সম্ভব।
- কোনো রকম চিকিৎসা দ্বারা বাহকের পরিবর্তন আনা সম্ভব নয়। বাহক হয়ে জন্মগ্রহণ করলে সারা জীবন তা বহন করতে হবে। বাহক কোনো সংক্রামক বা ছোঁয়াচে রোগী নয়। এতে নিজেকে লজ্জিত বা অপরাধী ভাবার কিছু নেই।

থ্যালাসেমিয়া রোগের বাহক নির্ণয়

থ্যালাসেমিয়া একটি জটিল সমস্যা। এ-সমস্যার ব্যাপারে বিশাল জনগোষ্ঠীর ওপর জরিপ চালানো খুবই কঠিন এবং কষ্টসাধ্য কাজ। তাই এ-ব্যাপারে গর্ভবতী মায়েদের ওপর জরিপ চালিয়ে কার্যক্রম সীমিত রাখা যেতে পারে। তাদেরকে সহজেই স্বাস্থ্য-সংক্রান্ত পরামর্শ দেওয়া যায় এবং এর ভয়াবহতা সম্পর্কে অবগত করা যায়। আক্রান্ত শিশুর নিকটাত্মীয়দের মধ্যেও জরিপ চালানো প্রয়োজন। নেস্ট্রফ (NESTROF) এবং ডিসিআইপি (DCIP) এমন দু'টি স্ক্রীনিং টেস্ট যার মাধ্যমে সহজে এবং অল্প খরচেই এ-রোগের বাহককে (carrier) চিহ্নিত করা সম্ভব। ভারত, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক এবং মালদ্বীপসহ দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশেই উপরোক্ত পরীক্ষা দু'টো বাহক নির্ণয়ে ব্যবহৃত হচ্ছে।

প্রিনেটাল ডায়াগনোসিস বা ভ্রূণ অবস্থায় রোগনির্ণয়

শিশু যখন মাতৃজঠরে থাকে তখন সন্তান প্রসবের অনেক আগে ভ্রূণ (embryo) পরীক্ষার সাহায্যে বলে দেওয়া যায় সন্তান থ্যালাসেমিয়া রোগে আক্রান্ত কী না। এই পরীক্ষাকে প্রিনেটাল ডায়াগনোসিস বলে। উন্নত বিশ্বে এটি একটি সুপ্রতিষ্ঠিত পদ্ধতি এবং আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারত, পাকিস্তান, ইরান, ইরাক, মালদ্বীপ, এমনকি জর্ডানেও ভ্রূণ অবস্থায় রোগনির্ণয়ের কার্যক্রম প্রচলিত আছে।

থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশুর জন্ম যে শুধু শিশুর দৈহিক সমস্যা সৃষ্টি করে এবং তার পরিবারের ওপর মানসিক ও অর্থনৈতিক চাপ সৃষ্টি করে তাই নয়, এটি গোটা সমাজ এবং দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপরও বিরাট প্রভাব ফেলে। থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত কোনো শিশু যেন জন্মগ্রহণ না করে সেজন্য বিশ্বব্যাপী চেষ্টা করা হচ্ছে এবং যারা এ-রোগে আক্রান্ত, তাদের কষ্ট কমিয়ে জীবনকে সুন্দর এবং জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে। থ্যালাসেমিয়াকে আমাদের দেশেও একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক ও জাতীয় স্বাস্থ্য সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত করতে হবে এবং ভবিষ্যতে থ্যালাসেমিয়ায় আক্রান্ত শিশু যাতে জন্মগ্রহণ না করে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। এজন্য দেশের সরকার, বিভিন্ন দাতা সংস্থা, বিত্তশালী গোষ্ঠী এবং সর্বোপরি সাধারণ জনগণের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে হবে। সবার আন্তরিক সহযোগিতার মাধ্যমে যদি উপরে বর্ণিত পদক্ষেপগুলো নেওয়া যায় তবে ধীরে ধীরে এই জটিল রোগ আমাদের দেশেও প্রতিরোধ এবং পর্যায়ক্রমে নির্মূল করা সম্ভব হবে। 'থ্যালাসেমিয়ামুক্ত বাংলাদেশ'—এটাই হোক আমাদের সকলের এই শতাব্দীর সম্মিলিত অঙ্গীকার।

মাসিক নিয়মিতকরণ: প্রেক্ষাপট বাংলাদেশ

ফারহানা সুলতানা, মনোয়ার জাহান, মেঘলা ইসলাম
আইসিডিডিআর,বি

বিশ্বব্যাপী ৭৬ মিলিয়ন মহিলা প্রতি বছর অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ করে থাকে, যাদের মধ্যে ৪২ লক্ষ মহিলার গর্ভপাত ঘটানো হয় ইচ্ছাকৃতভাবে। এদের মধ্যে ৪৮% গর্ভপাত হলো অনিরাপদ, যা অদক্ষ ব্যক্তির দ্বারা অস্বাস্থ্যকর পদ্ধতিতে সংঘটিত হয়। এসব অনিরাপদ গর্ভপাতের মধ্যে ৯৭% সংঘটিত হয় উন্নয়নশীল দেশে—যার মধ্যে বাংলাদেশও অন্তর্ভুক্ত। বাংলাদেশের এক-তৃতীয়াংশ গর্ভধারণ হলো অপরিকল্পিত। অপরিকল্পিত গর্ভধারণের কারণে গর্ভপাতের সম্ভাব্যতা অনেক বেড়ে যায়। যেসব দেশে আইনগতভাবে গর্ভপাত নিষিদ্ধ সেসব দেশে অনিরাপদ গর্ভপাতজনিত মৃত্যুহার ও দীর্ঘমেয়াদী অসুস্থতার হার অনেক বেশি দেখা যায়। বর্তমানে মাসিক নিয়মিতকরণ সেবা সহজলভ্য হওয়ায় এবং জন্মনিয়ন্ত্রণ সেবা ও গর্ভপাতের জটিলতা-সংক্রান্ত সেবা ব্যবস্থার পর্যাপ্ততার কারণে বাংলাদেশে গর্ভপাতপ্রসূত মৃত্যুহার ২০০১ সালে ৫% থেকে কমে ২০১০ সালে ১%-এ নেমে এসেছে।

বাংলাদেশে নারীর জীবনরক্ষার প্রয়োজন ছাড়া গর্ভপাত আইনত নিষিদ্ধ। তবে ১৯৭০ সাল থেকে মাসিক নিয়মিতকরণ (menstrual regulation—MR) আমাদের দেশে নীতিগতভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। কোথায় মাসিক নিয়মিতকরণ সেবা প্রদান করা হয়ে থাকে সেসম্পর্কে এবং এর নিয়ম-কানুন সম্পর্কে মহিলারা অজ্ঞ। যার ফলে অনেক মহিলা অদক্ষ সেবাদানকারী কতৃর্ক গর্ভপাত করিয়ে থাকে অথবা নিজেরাই গর্ভপাত করতে সচেষ্ট হয়। প্রজনন স্বাস্থ্য-সংশ্লিষ্ট স্বার্থে অনিরাপদ গর্ভপাত প্রতিরোধ করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এতে মহিলাদের জীবন রক্ষা হয়, স্বাস্থ্য রক্ষা হয় এবং গর্ভপাত-সংক্রান্ত ব্যয়ভার হ্রাস পায়।

মাসিক নিয়মিতকরণ কী

যেসব মহিলাদের মাসিক চক্র নিয়মিত হয় না তাদের মাসিক চক্র নিয়মিত করার প্রক্রিয়া হলো মাসিক নিয়মিতকরণ (এমআর)। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্যনীতি অনুযায়ী যাদের শেষ মাসিকের (LMP) প্রথম দিন থেকে আট সপ্তাহ মাসিক বন্ধ থাকে তাদের বেলায় প্যারামেডিক বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী দ্বারা এবং শেষ মাসিকের প্রথম দিন থেকে যাদের ১০ সপ্তাহ মাসিক বন্ধ থাকে তাদের বেলায় অভিজ্ঞ চিকিৎসক দ্বারা এমআর করানো হয়।

গর্ভপাত বলতে কী বোঝায়

গর্ভধারণের পর থেকে ২৮ সপ্তাহ পূর্ণ হওয়ার আগে গর্ভস্থ ভ্রূণ নষ্ট হলে তাকে গর্ভপাত বলা হয়ে থাকে।

গর্ভপাত মূলত দু'ধরনের:

১) স্বতঃস্ফূর্ত গর্ভপাত (যা আপনা আপনি হয়): গর্ভধারণের পর অনেক সময় গর্ভবতীর শারীরিক কোনো ত্রুটি বা কোনো দুর্ঘটনাপ্রসূত আঘাতের ফলে গর্ভপাত ঘটতে পারে।

২) ইচ্ছাকৃত গর্ভপাত (যা ইচ্ছাকৃতভাবে করা হয়): ভ্রূণ বিকশিত হওয়ার আগে কোনো জটিলতা দেখা দিলে ডাক্তারের পরামর্শে গর্ভপাত ঘটানো হয় বা গর্ভবতী নিজেই কোনো বিশেষ কারণে গর্ভপাত ঘটাতে চান।

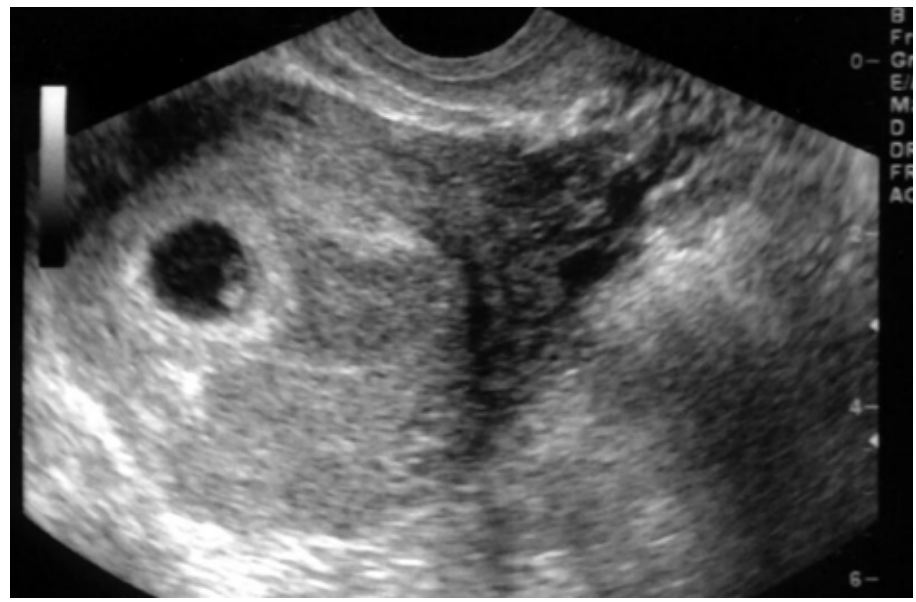

মাসিক নিয়মিতকরণের ক্ষেত্রে আল্ট্রাসনোগ্রামের সাহায্যে ভ্রূণের বয়স নির্ণয় করা যায়

বাংলাদেশে গর্ভপাত-সংক্রান্ত আইন

১৮৬০ সালে ঔপনিবেশিক ব্রিটিশ সরকার-প্রণীত প্যানেল কোডের সেকশন ৩১২-ভুক্ত আইন অনুযায়ী ইচ্ছাকৃত গর্ভপাত ঘটানো একটি দণ্ডনীয় অপরাধ। যেসব ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে গর্ভপাত করানোর কাজে জড়িত আছে এই আইন মোতাবেক তাদের জরিমানা করা এবং জেলে পাঠানোরও বিধান রয়েছে।

বাংলাদেশে কখন কীভাবে এমআর বৈধতা পেলো

মাসিক নিয়মিতকরণকে পরিবার পরিকল্পনার একটি পদ্ধতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বিভিন্ন ঘটনার ওপর ভিত্তি করে বিশেষ বিবেচনায় বাংলাদেশ সরকার এমআর-কে বৈধতা দিয়েছে। ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানী সৈন্যদের দ্বারা অজস্র বাংলাদেশী মহিলা ধর্ষিত হয়ে অনেকে গর্ভধারণ করেন। এধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ রোধ করতে মহিলাদের অনুমতিক্রমে 'manual vacuum aspirator' নামের একটি পদ্ধতির সাহায্যে গর্ভপাত করানোকে সরকার বৈধতা দান করে। এভাবেই জনসংখ্যা বৃদ্ধিজনিত সমস্যার কথা বিবেচনায় রেখে কিছু শর্তসাপেক্ষে পরবর্তীকালে সার্বজনীনভাবে তা বৈধ বলে ঘোষিত হয়। গর্ভপাত বাংলাদেশে আইনত নিষিদ্ধ হলেও গর্ভধারণের ১০ সপ্তাহের মধ্যে যারা গর্ভপাত করে তাদেরকে অগর্ভবতী হিসেবে চিহ্নিত করে পরবর্তীকালে বাংলাদেশ আইন সংস্থা এবং কিছু আর্ন্তজাতিক সংস্থা মাসিক নিয়মিতকরণকে পরিবার পরিকল্পনার একটি পদ্ধতি হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছে।

কোথায় এমআর করানো হয়

বাংলাদেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায়ে এমআর করানো হয়। বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীনস্থ পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এমআর সেবার জন্য দায়িত্বপ্রাপ্ত। এই কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর এবং তিনটি বেসরকারি সংস্থার মাধ্যমে এমআর-সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ ও সহযোগিতামূলক সেবা প্রদান করা হয়। নিম্নলিখিত সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্যসেবা কেন্দ্রে এমআর সেবা প্রদান করা হয়।

সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এমআর সেবা

জেলা হাসপাতাল, মা ও শিশু স্বাস্থ্য কেন্দ্র, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে এমআর সেবা দেওয়া হয়ে থাকে। কিছু কিছু সরকারি প্রশিক্ষন কেন্দ্র, যেমন: মডেল ক্লিনিক এবং মোহাম্মপুর ফার্টিলিটি সার্ভিস ট্রেনিং সেন্টারেও এমআর করানো হয়। এসব জায়গায় চিকিৎসক ও প্যারামেডিকগণ এমআর করে থাকেন, কিন্তু উপজেলা ও ইউনিয়ন

পর্যায়ে শুধুমাত্র ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভলান্টিয়ারগণ এই সেবা দিয়ে থাকেন। ২০০৪ সালের রিপোর্ট অনুযায়ী, এমআর বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ৬,৫০০ জন ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভলান্টিয়ার এবং ৮,০০০ জন চিকিৎসক সরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার ভলান্টিয়ারদের শিক্ষাগত যোগ্যতা ১০ম শ্রেণী পাস। এরপর পরিবার পরিকল্পনা এবং মা ও শিশু স্বাস্থ্যের যত্ন-সংক্রান্ত বিষয়ে তাঁরা ১৮ মাসের প্রশিক্ষণ লাভ করেন। চাকুরীতে নিয়োগের পর তাঁদেরকে এমআর করানোর প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে মহিলা সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট কমিউনিটি মেডিকেল অফিসারদেরকেও এমআর বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। কমিউনিটি ক্লিনিকে এমআর করানো হয় না। এমআর করানোর জন্য কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে উচ্চতর স্বাস্থ্য কেন্দ্রে পাঠানো হয়। সরকারি প্রতিষ্ঠানে বিনামূল্যে এমআর করানো হয়।

বেসরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রে এমআর সেবা

কিছু সংখ্যক বেসরকারি সংস্থাও এমআর-সংক্রান্ত সেবা দিয়ে থাকে, যেমন: রিপ্রোডাকটিভ হেলথ সার্ভিসেস ট্রেনিং অ্যান্ড এডুকেশন প্রোগ্রাম (RHSTEP) দ্বারা পরিচালিত ক্লিনিক, মেরী স্টোপস ক্লিনিক সোসাইটি, অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য প্রিভেনশন অফ সেপ্টিক অ্যাবোর্শন, ব্র্যাক, বাংলাদেশ উইমেন্স হেলথ কোয়ালিশন এবং ফ্যামিলি প্ল্যানিং অ্যাসোসিয়েশন অফ বাংলাদেশ। বেসরকারি ক্লিনিকে প্যারামেডিক, নার্স, মহিলা মেডিকেল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত স্বাস্থ্য সেবাদানকারী দ্বারা এমআর করানো হয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে চিকিৎসকগণও এমআর করে থাকেন। বেশিরভাগ বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এমআর-সংক্রান্ত পরামর্শদাতা আছে। বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে এমআর করানোর জন্য ৫০০ থেকে ২,০০০ টাকা পর্যন্ত নিয়ে থাকে।

মাসিক নিয়মিতকরণের পদ্ধতি

সরকারি ও বেসরকারি উভয় ধরনের কেন্দ্রসমূহে ১০ সপ্তাহ মাসিক বন্ধ থাকলে manual vacuum aspirator-এর সাহায্যে এমআর করা হয়ে থাকে। সাধারণত, মাসিকের শেষ দিন থেকে ৮ সপ্তাহ মাসিক বন্ধ থাকলে পরিবার কল্যাণকর্মীগণ manual vacuum aspirator-এর সাহায্যে এমআর করে থাকে। মাসিকের শেষ দিন থেকে শুরু করে ১২ সপ্তাহ পর্যন্ত মাসিক বন্ধ থাকলে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত চিকিৎসক দ্বারা ইলেকট্রিক vacuum-এর সাহায্যে এমআর করা হয়ে থাকে।

মাসিক নিয়মিতকরণ পরবর্তী সেবা

এমআর খুব সহজেই ১০-১৫ মিনিটে সম্পন্ন করা হয়। এমআর করার পর ১৫-২০ মিনিটের মধ্যেই সেবাগ্রহীতা স্বাস্থ্য কেন্দ্র ত্যাগ করতে পারেন এবং স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারেন। স্বাস্থ্যকর্মীকে মনে রাখতে হবে: জরায়ু ছিদ্র করার কারণে যদি সেবাগ্রহীতার প্রচুর রক্তক্ষরণ বা ব্যথা হয়, তাহলে তাকে স্বল্পমাত্রার ঘুমের ওষুধ, ব্যথানাশক ওষুধ, ক্ষতের স্থান অবশ করার জন্য অ্যানেস্থেশিয়া এবং প্রয়োজনবশত রক্ত বন্ধ করার ওষুধ দেবেন এবং স্বাস্থ্যসম্মত প্যাড ব্যবহার করার এবং পুনরায় স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আসার (follow-up visit) পরামর্শ দিবেন। এমআর করার পর স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে চলে যাওয়ার সময় সেবাগ্রহীতাকে মৌখিক বা লিখিত পরামর্শ দিতে হবে। অতিরিক্ত রক্তক্ষরণ কিংবা কোনো জটিলতা দেখা দিলে কী করতে হবে তা ভালোভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে।

এমআর গ্রহীতার করণীয় বিষয়সমূহ

এমআর গ্রহীতা ১৫ দিনের মধ্যে কোনো ভারী কাজ করবেন না, নোংরা কাপড় বা প্যাড ব্যবহার করবেন না। ১৫ দিন যৌনমিলন থেকে বিরত থাকবেন এবং এমআর-পরবর্তী শারীরিক অবস্থা পরীক্ষার জন্য ১৫ দিনের মধ্যে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যাবেন। এছাড়াও, এমআর করানোর পর যেসব পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া বা জটিলতা দেখা দিতে পারে সেগুলো সম্পর্কে এমআর গ্রহীতাকে অবগত করতে হবে, যেমন: সামান্য রক্তস্রাব, তলপেটে সামান্য ব্যথা, গর্ভধারণের লক্ষণ (মাথা ঘোরা, বমি বমি ভাব), ইত্যাদি। বেশিমাত্রায় রক্তস্রাব হলে, তলপেটে প্রচণ্ড ব্যথা হলে, গন্ধযুক্ত স্রাব হলে এবং কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসলে সঙ্গে সঙ্গে স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যেতে হবে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে এমআর করানোর পর যদি অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়া হয় তবে সংক্রমণের সম্ভাবনা কম থাকে। স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে এমআর করানোর পর অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়ে থাকে।

এমআর করানোর পর পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের পরামর্শ

ভবিষ্যতে অনাকাঙ্ক্ষিত গর্ভধারণ প্রতিরোধের জন্য পরিবার পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণের পরামর্শ দেওয়া খুবই জরুরী। এমআর করানোর পর স্বাস্থ্য কেন্দ্র ছেড়ে যাওয়ার আগে অবশ্যই এমআর গ্রহীতাকে জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি এবং এসব পদ্ধতি প্রাপ্তির স্থান সম্পর্কে তথ্য প্রদান করতে হবে, যেন এমআর গ্রহীতা তার পছন্দ অনুযায়ী পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারেন। মহিলাদের অবশ্যই জানাতে হবে যে, এমআর করার পর জন্ম নিয়ন্ত্রণের যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ না করা হলে ২ সপ্তাহ পর আবার গর্ভধারণ করার আশংকা থাকে, যা অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ।

এমআর একটি সহজ পদ্ধতি। এমআর করার পর সামান্য রক্তক্ষরণ হলেও তাতে কোনো অসুবিধা হয় না। সরকারি ও বেসরকারি স্বাস্থ্য কেন্দ্রসমূহে এমআর-সংক্রান্ত সেবা সহজে পাওয়া যায়। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, যেসব মহিলা প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সেবাদানকারীর দ্বারা এমআর-এর মাধ্যমে গর্ভনিরোধ করেছে তাদের মৃত্যুর আশংকা অনেক কমে গিয়েছে। এই কার্যক্রমের মাধ্যমে মহিলাদের প্রজনন স্বাস্থ্য ও অধিকারকে প্রতিষ্ঠিত করা প্রয়োজন।

জলবায়ু পরিবর্তন এবং বাংলাদেশ

মুসাফির মোঃ তাজুল ইসলাম
আইসিডিডিআর,বি

জলবায়ু পরিবর্তন একটি ধীরগতিসম্পন্ন প্রক্রিয়া যা দশক বা শতক ধরে চলছে। কিন্তু গত তিন-চার দশক ধরে পৃথিবীতে যে পরিবর্তনগুলো ঘটছে তা সবাইকে ভাবিয়ে তুলেছে। শিল্পায়নসহ মানবজাতির নানা কর্মকাণ্ড, বৃক্ষনিধন, খাল-বিল ভরাট, নদীতে বাঁধ নির্মাণ, গ্রীনহাউজ গ্যাস নিঃসরণ, এলনিনো এবং লা-নিনোর প্রভাবে বৈশ্বিক তাপমাত্রা বেড়ে চলেছে। বরফ গলার গতি বেড়েছে এবং তার সাথে সাথে সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফলে, পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, বন্যা, ঝড় ও সাইক্লোন আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। জাতিসংঘ জলবায়ু পরিবর্তন বা climate change-এর সংজ্ঞায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে মানুষের নানা কর্মকাণ্ডের দ্বারা জলবায়ুতে যে পরিবর্তন ঘটছে তার ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। ২০১০ সালে প্রকাশিত International Climate Change Risk Assessments রিপোর্টে বলা হয়েছে, "Bangladesh is the world's most vulnerable country. Rising sea levels threaten inundation and saline intrusion in the southern coastal region, the risk accentuated by prediction of greater cyclone intensity. The population of this area is projected to reach 44 million by 2015."

বিজ্ঞানীরা আশংকা করছেন, ২ ডিগ্রী সেলসিয়াসের ওপর তাপমাত্রা রাড়লে তা পৃথিবীতে ভয়াবহ বিপর্যয় বয়ে আনবে। বিশেষ করে বাংলাদেশের দক্ষিণের বরিশাল এবং ভোলাসহ 'বাংলাদেশের ঢাল' বলে খ্যাত সুন্দরবন পানির নিচে তলিয়ে যাবে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশের ওপর যেসব প্রভাব পড়তে পারে তা সম্পর্কিত বিভিন্ন গবেষনা থেকে প্রাপ্ত উপাত্ত তুলে ধরা হলো:

খাদ্য উৎপাদন ও খাদ্য নিরাপত্তা: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে হয় অতিবৃষ্টি অথবা অনাবৃষ্টি বৃদ্ধি পাবে। ফলে, খাদ্য উৎপাদন আশানুরূপ হবে না। অপুষ্টি বৃদ্ধি পাবে। খাদ্য নিরাপত্তা হুমকির সম্মুখীন হয়ে পড়তে পারে।

বাংলাদেশের ষড়ঋতুর পরিবর্তন: বাংলাদেশ ষড়ঋতুর দেশ। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ষড়ঋতু অনিয়মিত হয়ে উঠতে পারে। অতিবৃষ্টির ফলে দীর্ঘস্থায়ী বন্যা দেখা দিতে পারে। আবার কোথাও অনাবৃষ্টিতে মরুময়তা দেখা দিতে পারে।

মরুময়তা ও পরিবেশ বিপর্যয়: ভারত, পাকিস্তান, নেপাল এবং ভুটান, এই চারটি দেশ নিজেদের বিদ্যুতের চাহিদা পূরণ ও বাড়তি বিদ্যুত রপ্তানিকল্পে জলবিদ্যুত

জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে বন্যার প্রবণতা বেড়ে চলেছে

উৎপাদনের জন্য বাংলাদেশের উজানে হিমালয়কেন্দ্রিক ৫৫২টি বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা নিয়েছে যা থেকে ২ লাখ ১২ হাজার ২৭০ মেগাওয়াট বিদ্যুত উৎপাদিত হবে। হিমালয় পর্বতশ্রেণীবাহিত বাংলাদেশের প্রায় ৫৭টি নদী ভারত, নেপাল এবং ভুটান হয়ে বাংলাদেশে প্রবেশ করেছে। আন্তর্জাতিক এই নদীগুলোতে বাঁধ নির্মিত হলে বাংলাদেশ ব্যাপক মরুময়তা এবং পরিবেশ বিপর্যয়ের সম্মুখীন হবে। সবচেয়ে বড় বিপদের বিষয় হলো নদীর প্রবাহ কমে গেলে বঙ্গোপসাগরের লবণাক্ততা মূল ভূখণ্ডের অনেক ভেতরে চলে আসবে। ধ্বংসের মুখে পড়বে পৃথিবীর অন্যতম ঐতিহ্য 'সুন্দরবন'। ফসল ফলানো কঠিন হয়ে যাবে। সেতু এবং ভবনসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় মরিচা পড়বে। টিপাইমুখে বাঁধ নির্মিত হলে নদীর প্রবাহ কমে পানিশূন্যতায় ভরাট হয়ে যাবে নদীগুলো এবং এতে মরুকরণ শুরু হবে দেশের উত্তর-পূর্বাঞ্চলে। কৃষিকাজ ও খাদ্য উৎপাদন চরম সংকটে পড়বে। রুদ্ধ হয়ে যাবে পানিসম্পদের বণ্টন ও বিকাশ। বাংলাদেশের বিস্তৃত এলাকা সাহারার রূপ ধারণ করতে পারে। বায়ো ডাইভারসিটি নষ্ট হয়ে যাবে। বেড়ে যাবে নদী-ভাঙ্গন, ফলে উদ্বাস্তুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।

স্বাস্থ্য সমস্যা: জলবায়ু পরিবর্তনের সবচেয়ে ভয়ংকর প্রভাব পড়তে পারে স্বাস্থ্যের ওপর। বিজ্ঞানীরা গবেষনায় দেখেছেন, বাংলাদেশে ঋতু পরিবর্তন ও রোগ-ব্যাধির মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক্য রয়েছে। বিশেষ করে বৈশ্বিক উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে বায়ুমন্ডলের বিভিন্ন স্তরে যে পরিবর্তন ঘটছে তাতে পরিবেশ দূষণের ফলে পানি ও প্রাণীবাহিত জীবাণু দ্বারা সৃষ্ট রোগ-ব্যাধির প্রকোপ বেড়ে যাবে। বিশেষ করে কলেরা, ডায়রিয়া, যক্ষা, ম্যালেরিয়া, চর্মরোগ এবং শ্বসনতন্ত্রের রোগের মতো অসুখ-বিসুখগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

বাংলাদেশের করণীয়

বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনে বাংলাদেশ যে ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের মুখে পড়বে এ-বিষয়ে আন্তর্জাতিক মহলে তুলে ধরা অতীব প্রয়োজনীয়। ব্যাপকভাবে বৃক্ষরোপন ও বৃক্ষ সংরক্ষণ করে বনায়ন বৃদ্ধি করা দরকার। এছাড়াও, এসি, রেফ্রিজারেটর প্রভৃতিকে CFC-মুক্ত রাখা, ইটের ভাটা ও যানবাহনের কালো ধোঁয়া রোধ করা এবং গ্রীন হাউস গ্যাস নিঃসরণে 'কিয়োটো প্রটোকল' যথাযথভাবে মেনে চলা জরুরী। বাংলাদেশ কিয়োটো চুক্তির আওতাধীন 'আধুনিক প্রযুক্তিতে কার্বন নিঃসরণ হ্রাস' প্রকল্প থেকে এবং জাতিসংঘ কর্তৃক গঠিত তহবীল Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation (RED) প্রকল্প থেকে সুন্দরবনের গাছ থেকে কার্বন বিক্রি করে প্রায় ২০০ কোটি টাকা পেতে পারে। 'সুন্দরবন ফরেস্ট কার্বন ইনভেন্টরি-২০০৯'-শীর্ষক সমীক্ষায় দেখা গেছে, সুন্দরবনের সুন্দরী, গেওয়া, কেওড়া, লতাগুল্ম ও জৈব উপাদানে পাঁচ কোটি ৬০ লাখ টন কার্বন রয়েছে। জলবায়ু পরিবর্তনে সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে ক্ষতিপূরণের মোটা অংকের টাকা পাওয়ার দাবিদার বাংলাদেশ এবং এর জন্য যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বন্ধু জীবাণু প্রোবায়োটিক্স

এম করিম খান
কমিউনিটি বেইজড মেডিকেল কলেজ, ময়মনসিংহ

আমরা সাধারণত ভাবি জীবাণু মানেই অপকারী প্রাণী। কোথায় কোন ইনফেকশন হলো খুঁজে বের করো কোন জীবাণু এর জন্য দায়ী। তারপর অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগ করে তাকে ধ্বংস করো। কিন্তু সব জীবাণুই দেহের জন্য ক্ষতিকারক নয়। আমাদের দেহে আছে নানা নামের, নানা ধরনের উপকারী জীবাণু। আমরা তাদের নিয়ে খুব একটা ভাবি না। আমাদের অনেকে তাদের চিনিও না। এই বন্ধু জীবাণুগুলোই হচ্ছে প্রোবায়োটিক, যারা দৃষ্টির অগোচরে আমাদের জন্য প্রতিনিয়ত ভালো কিছু করে যাচ্ছে।

আমরা সবাই দই খেতে পছন্দ করি। এই দই কীভাবে তৈরি হয় তা কী আমরা ভেবে দেখেছি? দুধ থেকে দই তৈরি হয় আর তা তৈরি করে নানা ধরনের বন্ধু জীবাণু। অনেক জীবাণুই দই তৈরিতে সাহায্য করে, তবে ল্যাক্টোবেসিলাস বুলগারিকাস এবং স্ট্রেপ্টোকক্কাস থারমোফিলাসের নাম উল্লেখ না করলেই নয়। আমরা যখন দই খাচ্ছি তখন এই বন্ধু জীবাণুগুলোকেও খাচ্ছি আর তারা আমাদের নানাবিধ উপকার করে যাচ্ছে আমাদের অজান্তে।

যেসব শিশু নিয়মিত মায়ের বুকের দুধ খায় তাদের অন্ত্রে অগণিত বায়ফিডো ব্যাকটেরিয়া থাকে। এরা হজমে সাহায্য করে এবং ডায়রিয়া প্রতিরোধ করে। গবেষণায় দেখা গেছে, জন্মের ছয়মাস পর যখন শিশুকে বুকের দুধের পাশাপাশি অন্যান্য খাবার বা উইনিং ফুড দিতে শুরু করা হয় তখন শিশুর অন্ত্রের বন্ধু বায়ফিডো ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ কমতে থাকে এবং এর ফলশ্রুতিতে ডায়রিয়ার প্রকোপ বেড়ে যায়।

এই বন্ধু জীবাণুগুলো শুধু ডায়রিয়া প্রতিরোধ বা হজমেই সাহায্য করে না, তারা আমাদের আরো নানা উপকার করে থাকে, যেমন: রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায়, একজিমা ও এলার্জি কমায়, সেপসিস প্রতিরোধ করে, কলোনিক বা অন্ত্রের ক্যান্সারের ঝুঁকি কমায়, ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (IBS) কমায় এবং রক্তচাপ কমাতে সাহায্য করে। এমনি নানা উপকারে আসে এই বন্ধু জীবাণুগুলো।

এরা কীভাবে করে কাজ করে সেসম্পর্কে এখনও বিস্তারিতভাবে জানা যায় নি। তবে যতটুকু জানা গেছে তা হলো, এরা অন্ত্রে অরগানিক এসিড তৈরি করে, যা অন্ত্রের ক্ষতিকর জীবাণুগুলোকে মেরে ফেলে বা বংশবৃদ্ধিতে বাধা দেয়।

এই বন্ধু জীবানুগুলো অন্ত্রে এক ধরনের অ্যান্টিবায়োটিক তৈরি করে খারাপ জীবাণুগুলোকে ধ্বংস করে। এরা অন্ত্রে অন্যান্য ক্ষতিকর জীবাণুর পুষ্টিতে ভাগ বসায় এবং তাদের বংশ বিস্তারে বাধা দেয় এবং আন্ত্রিক ক্যান্সার সেল-এর বৃদ্ধি বা প্রসারে বাধা দেয়।

বুকের দুধ, দই, ইত্যাদি থেকে আমরা নানা ধরনের বন্ধু জীবাণু বা প্রোবায়োটিক্স পেতে পারি। অপ্রয়োজনীয় অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহারে এই বন্ধু জীবাণুগুলো ধ্বংস হয়ে যায়। তখন ক্ষতিকর জীবাণু দ্রুত জায়গা দখল করে নেয়, আর আমরা অসুস্থ হয়ে পড়ি।

আজকাল অনেক ওষুধ কোম্পানী প্রোবায়োটিক তৈরি ও বাজারজাত করছে। আমাদের দেশেও এগুলো পাওয়া যায়। প্রোবায়োটিক্সের তেমন কোনো পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া নেই। আসুন, আমরা বিধাতাপ্রদত্ত বন্ধু জীবাণুগুলো ধারণ, লালন ও বর্ধন করি এবং প্রাকৃতিক উপায়ে নিরোগ থাকি।